# কাব্যিক মূল্যায়নে চৈতন্যচরিত

## জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণি দাস

ড. চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

এম.এ., বি.এড্, পি-এইচ.ডি.

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

## ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা

এম.এ., পি-এইচ.ডি, ডি.লিট
প্রফেসর ও প্রাঃ বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
প্রাঃ সঞ্চালক ঃ বাংলা ডি.এস.এ
প্রাঃ সঞ্চালক ঃ বাংলা এম.এ. করেসপনডেনস কোর্স

ফোন ঃ (০৩৪২) ২৫৫৬০৮২
এ/৬, তারাবাগ
বর্ধমান - ৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

**বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়**

সম্পাদক ঃ বর্ধমান লোকসংস্কৃতি একাডেমি
সভাপতি ঃ কবিতা সন্ধ্যা, বর্ধমান


## পরিচায়ণ

সম্প্রতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পাঠক বড়ো বিরল। গবেষকও তেমনি আঙুলে গোনা যায়। অধ্যাপকের সংখ্যাও বড়ো কমতির মুখে। এর প্রতি শিক্ষিত সমাজে এখন বড়ো অনীহা। এখন বড়ো বেশি আধুনিক চেতনার দাপাদাপি। টি.ভি, ভি.সি.ডি-র স্বর্গমর্ত্য জল স্থলবিহারী পদচারণায় মানুষ বড়ো মুগ্ধ। তাই মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত সঙ্গত কারণেই বড়ো বিরক্তিকর। এখন অনেক আধুনিক কবিই অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেন। তাই সেই ৫০০ বছর আগেকার বৈষ্ণবদের কথা এখন তোলাই বিপত্তিকর। এত ব্যস্ততার সময়ে, খাদ্যান্বেষণের তাগিদায় কে আর এইসব মৃত জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে যাবে বলুন? এমনি করেই যখন আমাদের দেশীয় সমস্ত পুরাতন কাব্য সাহিত্য বিসর্জনের বাজনায় জড়তাগ্রস্ত এবং 'হরি-সাহিত্যে' যখন হরিবোল ধ্বনি, তখন মাত্র গুটিকয়েক গবেষক ও অধ্যাপক তাঁদের প্রাণ ঢেলে এইসব অকাজের ঐতিহ্যের প্রতি নিশ্ছিদ্র শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। এঁরা চাকরির মোহ কাটিয়েছেন, সম্মানের আড়ম্বর এড়িয়েছেন, লাভালাভের প্রশ্ন সরিয়েছেন, এবং এই বহু অনাদৃত, বহু উপেক্ষিত প্রায় পরিত্যজ্য অথচ দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে বাঙালি শ্রোতা-মনের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত, এইসব সাহিত্যগুলির পরিচায়ণ প্রচারণ ও পুনর্মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন।

তাঁদেরই মধ্যে একজন চিহ্নিত গবেষিকা শ্রীমতী ডঃ চন্দ্রা ব্যানার্জী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি এক কৃতী ছাত্রী। সুদীর্ঘ দিন ধরে তিনি এমনি এক মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারার উপরে নিজের বিদ্যাচর্চাকে সমর্পণ করেছিলেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম, ব্যাপক অনুসন্ধান, অমানুষিক অধ্যয়ন ও দেশজোড়া পরিভ্রমণ করে তিনি ষোড়শ শতকের তিন কবি ও বৈষ্ণব জীবনীকার জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণিদাসের জীবনী ও কাব্য নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেছেন এবং সেজন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালে তিনি পি-এইচ. ডি উপাধি অর্জন করেছেন। তাঁর সেই বহু প্রশংসিত থিসিসের একটি নবতর ও আস্বাদবহ রূপ তাঁর বর্তমান গ্রন্থ 'কাব্যিক মূল্যায়ণে চৈতন্যচরিত — জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণিদাস।'

ষোড়শ শতকের তিন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ও সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিত-রচয়িতা জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণিদাস। এঁরা শ্রীচৈতন্যের অসামান্য জীবনকথা ও তাঁর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি নিজ নিজ কাব্যে উপস্থাপন করেছেন। এই দুটি দিকই গবেষিকা ডঃ ব্যানার্জি তাঁর এই অনন্য গবেষণায় যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ প্রয়োগে চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রদর্শন

করেছেন। এই তিন কবির তুলনামূলক অধ্যয়নে তাঁর গ্রন্থটি বৈষ্ণব কাব্য ও বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র গবেষণারূপে চিহ্নিত হয়েছে।

এক। তাঁর গ্রন্থের প্রধান দুটি দিক—

এই গ্রন্থেই তিনি এ দেশে প্রথম জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণি দাসের প্রামাণ্য জীবনী রচনা করেছেন। এঁদের জীবনকথা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো উল্লেখ্য গবেষণা আমাদের নজরে পড়েনি। চূড়ামণিদাস তো উপেক্ষার অন্ধকারে তলিয়েই গিয়েছিলেন। ডঃ ব্যানার্জী তাঁর অদম্য কৌতূহল ও কঠিন কায়ক্লেশে দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে এই তিন কবির এমন সমুল্লেখ্য জীবনী রচনা করেছেন, যা ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শুকদেব সিংহ, ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাচ্য ভারতের স্মরণীয় অধ্যাপকেরা লিখিতভাবে প্রশংসা করেছেন এবং কেউ কেউ তাঁর গবেষণার তথ্য গ্রহণ করে গবেষিকাকে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁদের এই স্বীকৃতি আমার এই ছাত্রী গবেষিকাকে আরও গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

দুই। মহামানব শ্রীচৈতন্যের জীবনযাত্রা, তাঁর কর্ম ও মননচিন্তা, তাঁর ধর্ম প্রচারণা, ভক্ত সম্পর্ক ও সমাজ আদর্শ সংঘটনে এই কবিত্রয়ের বিভিন্নমুখী ভাবনাকে শ্রীমতী ব্যানার্জী যথার্থ সমাজবিজ্ঞানীর মতোই এ গ্রন্থে প্র. ।নি করেছেন। তাঁর অভিনব বিশ্লেষণে চৈতন্যকে ঘিরে ভক্ত সমাজের উচ্ছ্বাস ও উল্লাস, ভক্তি ও ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা কেমন উদ্বেল হয়েছিল, এই তিন কবির রচনার নিরিখে তিনি তা উপস্থাপন করে আমাদের অভিভূত করেছেন।

এই সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতটি তুলে ধরে তিনি সাম্প্রতিক ইতিহাসকারদের কাছে সাধুবাদ লাভ করেছেন। তাঁর থিসিসের অংশবিশেষ পাঠ করে মন্দির-বিশেষজ্ঞ তারাপদ সাঁতরা, বর্ধমানের ঐতিহাসিক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বাঁকুড়ার ইতিবৃত্তকার ও চণ্ডীদাস একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং নদিয়ার ঐতিহাসিক মোহিত রায় লিখিতভাবে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা যে কোনো কালের, যে কোনো গবেষিকার পক্ষেই শ্লাঘার বিষয়।

চৈতন্যের জন্মের পূর্বকাল থেকে তাঁর মৃত্যুর কিছু পরবর্তীকাল পর্যন্ত সেকালীন বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থা, যানবাহন, যোগাযোগ, ব্যবসাবাণিজ্য, জীবিকা, গৃহ ও গৃহস্থালি, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ, সামাজিক লোকাচার, ধর্মকর্ম, কাব্যানুশীলন ও শাস্ত্রচর্চা, আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলো, নাচগান বাজনা, সংস্কার বিশ্বাস এমনকি সেকালের জীবজন্তু, ফুলফল প্রভৃতি তথ্যের উপস্থাপনে বর্তমান গ্রন্থটি বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি দলিল রূপে চিহ্নিত হবে।

বস্তুত এই গ্রন্থে গবেষিকার প্রভূত অধ্যয়নও একনিষ্ঠ ক্ষেত্র গবেষণার সঙ্গে গভীর রসানুভূতি ও ব্যুৎপত্তির সাক্ষর বর্তমান। তাই শুধু পণ্ডিতেরাই নন, যে কোনো উৎসাহী অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্র এবং যে কোনো কৌতূহলী পাঠকমাত্রই এই গ্রন্থ থেকে বহু অজানা তথ্যের সন্ধান পাবেন, বহু আলোচিত তথ্যের পুনর্মূল্যায়ন পাবেন। এবং একসঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যপাঠের আনন্দ লাভ করবেন। তাই ডঃ চন্দ্রা ব্যানার্জীকে আমি অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "সস্নেহ ও নন্দিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।"

২২শে আশ্বিন, ১৪১০
(ইং. ৯ই অক্টোবর, ২০০৩)

মিহির চৌধুরী কামিল্যা

# নিবেদন

বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষণা যেমন প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য, তেমনি বৈষ্ণবগ্রন্থালোচনাও দুরূহ জটিল। বিশেষ অবতারকল্প মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জীবন চরিত সাহিত্যের মূল্যায়ন করা দুরধিগম্য বিষয়। তার উপর মধ্যযুগের যে সব জীবনচরিতকার জীবনীকাব্য রচনা করে গেছেন, তা থেকে আমরা এগিয়ে এসেছি আরো পাঁচশ বছর। এই পাঁচশ বছরে আমাদের সমাজ, পরিবেশ, ও মানসিকতার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি পাঁচশ বছর আগেকার তথ্য আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। তাই আমার আলোচ্য তিন কবি জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণি দাসের প্রামাণ্য জীবনী রচনা যেমন প্রচণ্ড ক্ষেত্রগবেষণাধর্মী বিষয় তেমনি অকল্পনীয় শ্রমদানেরও পরিচায়ক। তার উপর তাঁদের রচিত গ্রন্থের পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়াও একালে বড়ো দুর্লভ ব্যাপার। আর তার উপর আছে প্রসিদ্ধ সমালোচকদের পরস্পর বিরোধী মতামত। ফলে আমার আকাঙ্ক্ষিত "কাব্যিক মূল্যায়নে জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত গ্রন্থ"টি পরিসমাপ্ত করতে দীর্ঘদিন সময় অতিক্রান্ত হল। জীবনতথ্য সংগ্রহ, পুঁথি সংগ্রহ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মতামত প্রভৃতি যেমন ছিল আমার ক্ষেত্র গবেষণার বিষয় যেখানে আমি ছবির পরে ছবি তুলেছি, পুঁথির নানা চিত্র জেরক্সের পর জেরক্স করেছি, বহু প্রাচীন ব্যক্তির কাছে ছুটে গিয়েছি তেমনি কোথাও কোনো সামান্য তথ্যের নামগন্ধ পেলে আমার গবেষকধর্মী মন চঞ্চল হয়েছে। আমি দিনের পর দিন গ্রামের পর গ্রাম, গ্রন্থাগারের পর গ্রন্থাগারে যেমন ছুটে গেছি তেমনি অগণিত পণ্ডিতদের মতামত নেবার জন্যেও বারবার গেছি। প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থের সূত্র ধরে আমি কখনো একাকী বা কখনো আমার স্বামী শ্রী বিশ্বু ব্যানার্জীর সঙ্গে বা কখনো আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ড. সুব্রত রায় ও অনুজ ভ্রাতা শ্রীমান সুশান্ত রায় কখনো বা দেবর অজয় ব্যানার্জীর সঙ্গে বহু স্থানে বাসে, ট্রেনে ও পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয়েছি। যেমন বড়োয়া, শ্রীখণ্ড, কালনা, কাটোয়া, কাকুটিয়া, কোগ্রাম, মুলুক, শীতল-গ্রাম, জলন্দি, কেতুগ্রাম, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি অগণিত স্থান।

এই সমস্ত স্থানে প্রাচীন ব্যক্তিদের জনে জনে ডেকেছি। উৎকর্ণ হয়ে তাদের কথা শুনেছি, বহু টেপ করেছি, বহু কথা লিখে এনেছি। এই সব স্থানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের আলোকচিত্র তুলেছি। যে সমস্ত ব্যক্তির অকৃপণ সাহায্য লাভ করেছি তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আমার ক্ষেত্র গবেষণায় উপস্থিত হয়ে আমাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। যেমন — শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ ঠাকুর, অঞ্জলি গোস্বামী, সনাতন কোঙার, রমাবতী কোঙার, জানেমন হালদার, কাশীনাথ ঘোষ, গোরাচাঁদ ব্যানার্জী, মাধবানন্দ দাস বাবাজি, মহিমারঞ্জন মুখার্জী, বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বংশীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। আমি এঁদের সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম নিবেদন করি।

দ্বিতীয় পর্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং জেলা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গুণী ব্যক্তিগণ যাঁদের সাহচর্যে আমার গবেষকধর্মী মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে। এঁরা হলেন — ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. ক্ষুদিরাম দাস, ড. কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. তুষারকান্তি মহাপাত্র, ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুশীল সেন, তারাপদ সাঁতরা, শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, নির্মল চন্দ্র প্রমুখ। এঁদের চরণে সভক্তি বিনীত প্রণাম। বিশ্ববন্দিত বিদ্বান, আচার্য প্রফেসর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের স্নেহে আমার সমস্ত গবেষণা সমৃদ্ধ। তাঁকে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম।

আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট প্রাপ্ত প্রফেসর ও প্রাক্তন বাংলা বিভাগের প্রধান ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যার তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা সম্পন্ন করেছি। ছাত্রীর প্রতি তাঁর ও তাঁর পত্নীর উৎসাহ দান ও অকৃপণ সাহায্যে এবং সন্তানস্নেহে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। আজ আমার এই আচার্যদেব ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা মহাশয় ও তদীয় সহধর্মিণী সবিতা চৌধুরী মহাশয়াকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এই গ্রন্থটি তাঁদেরই শ্রীচরণে উৎসর্গ করে আমি কৃতার্থ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণতম প্রফেসর ড. বিজিত কুমার দত্ত এবং তদীয় পত্নী আমার অধ্যাপিকা ড. সুনন্দা দত্ত প্রতিনিয়িত আমাকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন তা আমার চিরকালীন সম্পদ। প্রফেসর ড. সুমিতা চক্রবর্তী আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং দ্রুত গবেষণার পথে উপদেশাদি দিয়েছেন তা আমাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছে। এছাড়া প্রবীণ প্রফেসর শক্তিপদ ঘোষ; অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, প্রফেসর স্বপন বসু ও অন্যান্য অধ্যাপকগণও আমার গবেষণার প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করেছেন তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। এঁদের প্রতি আমার বিনম্র প্রণাম।

আমার স্বামী শ্রী বিশ্বু ব্যানার্জী আমার এই গবেষণার কর্মে যেমন সর্বতোমুখী সাহায্য করেছেন তেমন গ্রন্থটি রচনা থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে উৎসাহ দান ও নিরলস সাহায্য করে এসেছেন, তাঁর অবদান গ্রন্থের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। আমার শ্বশুর হরিদাস ব্যানার্জী ও শাশুড়ি মাতা গৌরী ব্যানার্জী আমাকে প্রতিদিন সংসার থেকে মুক্ত করে যেভাবে গবেষণা কর্মে প্রলুব্ধ করেছেন তা আমি কখনো ভুলব না। তাঁদের উদ্দেশে তাঁদের শ্রীচরণে আমার সভক্তি প্রণাম। এবং আমার কনিষ্ঠা ননদ শ্রীমতী অর্চনা গোস্বামী ও ননদাই শ্রীকান্ত গোস্বামীর অপরিসীম সহযোগিতা স্বীকার করতেই হয়। আমার পুত্র শ্রীমান ঋদ্ধি ব্যানার্জী আমাকে সর্বতোভাবেই সাহায্য করেছে। এছাড়া, আমার পুত্রবৎ রাজকুমার চক্রবর্তীর অনলস শ্রম ও সহযোগিতায় গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। এদেরকে তাই কৃতজ্ঞতা নয় স্নেহাশিস জানাই। এছাড়া বহু গ্রন্থাগারেও আমি বারবার গিয়েছি যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চৈতন্য রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, চৈতন্যডোবা, জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা ও বিষ্ণুপুর), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় ও সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, বর্ধমানের জেলা গ্রন্থাগার, বরাহনগর পাঠবাড়ি, বিশ্বভারতী, শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া লাইব্রেরি প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের শুধু গ্রন্থাগারিকই নন প্রত্যেকটি কর্মীই আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন সেজন্য আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

পুনশ্চ প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ক পরমাগ্রহে গ্রন্থটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন এবং যথাসম্ভব সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমি কত মানুষের যে সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং কবির জন্মভূমি সহ কতস্থানে যে গিয়েছি, কত মানুষের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছি তা লিখে শেষ করা যাবে না। এইভাবে সমস্ত শ্রম আমার সমস্ত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিবেচনা দিয়ে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

গ্রন্থটি রচনা করবার সময় 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান বিধি'র যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

২২শে আশ্বিন, ১৪১০
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন

বিনীতা
চন্দ্রা ব্যানার্জী

# সূচিপত্র


ভূমিকা : এক-এগারো

চিত্রসূচি : তেরো-চোদ্দ

চিত্র : ১৫-২৬

লিপি : ২৭-৩২

মানচিত্র : ৩৩-৩৮

**প্রথম অধ্যায়** : শ্রীচৈতন্য ও সমসাময়িক যুগ ৩৯-৬৩

**দ্বিতীয় অধ্যায়** : কবিত্রয়ের জীবনী ও কাব্য পরিচিতি ৬৪-২৩০

## এক. জয়ানন্দ

### (ক) কবি জীবনী

১. জীবৎকাল ৬৪

২. জন্মস্থান ৬৯

৩. পিতৃ-মাতৃ পরিচয় ৭৩

৪. গুরু প্রসঙ্গ ৭৬

৫. শিক্ষাদীক্ষা ও প্রাসঙ্গিক বিষয় ৭৮

৬. বৈষ্ণব ভাবনা ৮৫

### (খ) কাব্য পরিচিতি

১. রচনাকাল ৮৭

২. সামাজিক তথ্য ৯১

৩. ঐতিহাসিক উপাদান ১১৫

## দুই. লোচনদাস

### (ক) কবি জীবনী

১. জীবৎকাল ১৫৩

২. জন্মস্থান ১৫৬

৩. পিতৃ-মাতৃ পরিচয় ১৫৭

৪. গুরু প্রসঙ্গ ১৫৯

৫. শিক্ষাদীক্ষা ও প্রাসঙ্গিক বিষয় ১৬২
৬. বৈষ্ণব ভাবনা ১৬৭

(খ) **কাব্য পরিচিতি**

১. রচনাকাল ১৬৯
২. সামাজিক তথ্য ১৭২
৩. ঐতিহাসিক উপাদান ১৮৯

## তিন. চূড়ামণি দাস

কবিজীবনী ও কাব্য পরিচিতি ২০৬
১. সামাজিক তথ্য ২১০
২. ঐতিহাসিক উপাদান ২২২

**তৃতীয় অধ্যায়** : শ্রীচৈতন্য ঃ তাঁর জীবন ব্যাখ্যা ও চরিত্র নির্মাণে জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণি দাসের বৈশিষ্ট্য। ২৩১-২৯৮

**চতুর্থ অধ্যায়** : শ্রীচৈতন্যের ধর্মভাবনায় জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণি দাসের কৃতিত্ব। ২৯৯-৩২৮

**গ্রন্থপঞ্জি** : ৩২৯

# ভূমিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জীবনচরিত রচয়িতা 'চৈতন্যচরিতামৃত' স্রষ্টা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর পরে যাঁর নাম, তিনি 'চৈতন্যভাগবত'কার বৃন্দাবন দাস। এই দুই জীবনীকারের পরেই চৈতন্য জীবনচরিত রচয়িতা হিসেবে যাঁদের নাম পাই তাঁরা হলেন 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা জয়ানন্দ, অপর একটি 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাস ও 'গৌরাঙ্গবিজয়' প্রণেতা চূড়ামণি দাস। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে শেষোক্ত ত্রয়ী প্রধান কবি নন, এবং সমকালে ও পরবর্তীকালে এবং আজও এঁরা কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবন দাসের মতো কি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সমাজে, কি সমালোচক সমাজে, কি পাঠক সমাজে ততটা মর্যাদা পাননি। চূড়ামণি দাসের কাব্যটি খণ্ডিত বলে তাঁর কবিত্ব বিচারের সার্বিক সুযোগই নেই। আবার বৈষ্ণব ভাবাবেগের কোনো কোনো কারণে জয়ানন্দ বা লোচন সেকালেও আদৃত হননি। কিন্তু এঁদের কাব্যগুলি পাঠ করলে আমরা একালের পাঠকেরা এমন সমস্ত অভিনব তথ্যের সন্ধান পাই, যাতে আমরা চমকিত না হয়ে পারি না। একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে এই তিন কবি শুধু বৈষ্ণব জীবনীকারই ছিলেন না, এঁরা ছিলেন একাধারে বৈষ্ণব ঐতিহাসিক, বৈষ্ণব ভৌগোলিক, সমাজ পর্যবেক্ষক ও সুনিপুণ গায়ক। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ (লোচনদাস ও চূড়ামণি দাস) পদ-রচয়িতাও ছিলেন, তবে সঙ্গীতে ও বাদ্যে এঁদের যে যথেষ্ট অধিকার ছিল, তা কাব্যগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়।

দ্বিতীয়ত এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মানসিকতা অনুসারে চৈতন্যদেবকে অর্থাৎ তাঁর জীবনকে ও তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মকে উপলব্ধি করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো দুরধিগম্য দর্শন শক্তির প্রকাশ এঁদের কাব্যে নেই, কিন্তু সাধারণ কবির দৃষ্টিতে একজন মহাপুরুষকে যেভাবে অনুভব করা যায়, সেই বস্তুটি এঁদের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনে একটি অভাবনীয় ঘটনা। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচকের ভাষায়: "শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও জীবনলীলা শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোনো ঘটনাই জাতীয় জীবনে এত সুদূর-প্রসারী ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। চৈতন্যধর্মের ভাবপুষ্ট বাঙালি জাতি যেন নূতন জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার জীবনযাত্রায় তাহার কর্মে ও মননচিন্তনে, তাহার কাব্যসাহিত্যে, তাহার সমাজ-আদর্শ সংগঠনে ইহার প্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোনো এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালোবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত নির্ঝর, অলঙ্কার, দর্শন ও বিধি রচনার এমন আশ্চর্য মনন-শক্তি, ধর্মচেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।"[১]

---

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আদি, মধ্য, আধুনিক যুগ, ১৯৬৩), পৃ. ৭৪-৭৫।

শ্রীচৈতন্যের সেই অসামান্য জীবন ও তাঁর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট উপাদানগুলি জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণি দাস কীভাবে নিজ নিজ কাব্যে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন বর্তমান গবেষণা মূলক গ্রন্থে তাই প্রকাশিত হয়েছে। আর তারই সঙ্গে বৈষ্ণব জীবনী কাব্য সৃষ্টিতে এই কবিত্রয়ের বিশিষ্ট অবদান কতখানি, তাও অনুধাবন করা হয়েছে। সেজন্যেই আমরা আমাদের আলোচনাকে নিম্নোক্ত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

**প্রথম অধ্যায় ঃ** শ্রীচৈতন্য ও সমসাময়িক যুগ

**দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ (ক) কবি জীবনী ঃ**

এক. জয়ানন্দ, দুই. লোচনদাস, তিন. চূড়ামণিদাস —

প্রত্যেক্যের —

১. জীবৎকাল
২. জন্মস্থান
৩. পিতৃমাতৃ পরিচয়
৪. গুরু প্রসঙ্গ
৫. শিক্ষাদীক্ষা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়
৬. বৈষ্ণব ভাবনা

**(খ) কাব্য পরিচিতি ঃ** প্রত্যেক কবির কাব্যের

১. রচনাকাল
২. সামাজিক তথ্য
৩. ঐতিহাসিক উপাদান

**তৃতীয় অধ্যায় ঃ শ্রীচৈতন্য ঃ** তাঁর জীবন ব্যাখ্যা ও চরিত্র নির্মাণে জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণিদাসের বৈশিষ্ট্য।

**চতুর্থ অধ্যায় ঃ** শ্রীচৈতন্যের ধর্মভাবনায় জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণিদাসের কৃতিত্ব।

**গ্রন্থপঞ্জি ঃ**

প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু শ্রীচৈতন্য ও সমসাময়িক যুগ। শ্রীচৈতন্যদেবের মহান ব্যক্তিত্বকে ও তাঁর জীবনধর্মকে উপলব্ধি করতে হলে সামাজিক প্রেক্ষিতটি আলোচনা অবশ্য করতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম পঞ্চদশ শতক। কিন্তু আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করবার জন্য চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বের সময় থেকে অর্থাৎ, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস চিত্রিত করেছি। কারণ এই সময়ের ইতিহাস উপস্থাপিত হলেই আমরা চৈতন্যের আবির্ভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব। চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম কোনো পরিপ্রেক্ষিতে ও কীভাবে সমকালীন মানুষকে প্রলুব্ধ করল এবং কেমন করেই বা পূর্ববর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়কে ঠেলে ফেলে নবতর অধ্যায় সূচিত হল এইটি জানার জন্যে আমরা প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ, গ্রন্থটির সূচনাতেই বিষয়টিকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে বিশ্লেষিত করেছি। এগুলি হল —

ক. রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত
খ. সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত
গ. অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত
ঘ. ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত
ঙ. সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত

চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ও মৃত্যু ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জন্মের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ। এই ভয়াবহতার চিত্র 'চৈতন্য ভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি চৈতন্যজীবনীতে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এর উপর ঐতিহাসিক-সমর্থনও আছে। এমন কি আমাদের আলোচ্য জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণিদাসের গ্রন্থেও কম বেশি এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ববর্তী সময়ে ও চৈতন্যদেবের জন্মকালীন সময়ে 'গৌড়েশ্বর' ছিলেন জলালুদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১ বা ৮২ খ্রিঃ থেকে ১৪৮৭ বা ৮৮ খ্রিস্টাব্দ)। জলালুদ্দিন ফতেহ শাহের পর ফিরোজ শাহ, মুজাফ্ফর শাহ, হাবশ খান, কাফুর প্রমুখ হাবশি সেনা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। শামসুদ্দিন মজুফ্ফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই মুজাফ্ফরের উজির ছিলেন হোসেন শাহ। হোসেন শাহই পরবর্তীকালে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরয়েৎ' নীতিতে শামসুদ্দিন মুজাফ্ফরকে হত্যা করেছিলেন এবং বাংলার মসনদ দখল করেন। হোসেন শাহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৩ খ্রিঃ থেকে আনুমানিক ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ববর্তী ও জন্মকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটি আমরা ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছি এবং সমসাময়িক গৌড়েশ্বর বা সুলতান হুসেন শাহকে যেমন ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমর্থনে উল্লেখ করেছি তেমনি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্যের সমর্থনে হুসেন শাহের রাজত্বকালকে নির্দেশ করেছি। হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে শ্রীকর নন্দীর মহাভারত (যা 'ছুটি খানের মহাভারত' নামে খ্যাত) লিখিত হয়। নুসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহের প্রেরণায় 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের প্রথম কবি শ্রীধর কাব্য রচনা করেন। এর পরই ১৫৩৩ খ্রিঃ-৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত গিয়াসুদ্দিনের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে হুসেন শাহি বংশের অবনতি ঘটে। এবং শের শাহ গৌড়দেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। শের শাহের পর কররানি বংশের শাসনধারা চলতে থাকে এবং কররানি বংশের পর মুঘল সাম্রাজ্যের বাংলায় গোড়াপত্তন হয়। আমরা পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটি উপস্থাপন করেছি। বাংলায় বিভিন্ন রাজবংশীয় শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতনের ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাস, জনজীবনধারা ও সাংস্কৃতিক বিষয়টি খুবই জটিল হয়ে পড়ে। সেই সময় এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলার সামাজিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল, তারও প্রয়োজনানুগ ভাবেই উল্লেখ করেছি। আমরা বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনার সাথে সাথে অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটি উত্থাপন করেছি। তৎকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে মানবজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, এহেন সময়ে বাংলার সুলতানদের নিজ প্রয়োজনে, ব্যবসা বাণিজ্যের তাগিদে অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটে এবং অনেক হিন্দুরা নিজ নিজ জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে সুলতানদের অধীনে কাজ করতেন। যেমন — রূপ সনাতন, কেশব ছত্রী, মুকুন্দ দাস প্রমুখ। আবার, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব থেকে সাংস্কৃতিক বিষয়টি এবং ষোড়শ শতকের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতটি আলোচনার খুবই প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করেছি তাই ওই সময়ের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতটি আমরা আলোচনা করেছি। কারণ, ষোড়শ শতক ছিল সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার স্বর্ণময় যুগ।

তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও অর্থনীতির অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের গুরুত্ব আমরা উপস্থাপন করেছি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচার সমকালের মানুষকে কীভাবে উদ্‌বোধিত করেছিল বর্তমান অধ্যায়ে তারই সূচনা লক্ষ্য করেছি। এই সঙ্গে শ্রীচৈতন্য যে পারিষদমণ্ডলে নিজেকে চন্দ্রের মতো প্রকাশ করেছিলেন, সেই পরিমণ্ডলটিও প্রস্তাবন করেছি। শ্রীচৈতন্যকে 'চন্দ্র' বলে উপমিত করলে, সেই চন্দ্র প্রকাশিত হয়েছিল 'তারকাবৎ' অগণিত গুণী ভক্ত শিষ্যদের মধ্য থেকে। তাঁরা হলেন শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর, গৌরীদাস, নিত্যানন্দ, রূপসনাতন, রায়রামানন্দ, মুকুন্দ, নরহরি সরকার প্রমুখ। তাই অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রত্যক্ষদর্শী এই সমস্ত পরিকরদের জীবনকথাও উপস্থাপনের প্রয়োজন ছিল। বস্তুত চৈতন্যদেবের জীবন প্রকাশে এঁদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে আমরা জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণিদাসের গ্রন্থে চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম আবিষ্কারের পূর্বেই একটি প্রেক্ষাপট রচনা করেছি। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে 'চৈতন্যের যুগ ও সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব' পরিচায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে আমরা আলোচ্য তিন কবির বিস্তৃত জীবনী এবং তাঁদের কাব্যের যথাযথ পরিচয় উদ্ধার করেছি। আর সেজন্যে অধ্যায়টিকে দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নিম্নোক্তক্রম অনুসারে আমরা কবিদের জীবনী রচনার প্রয়াস পেয়েছি। প্রত্যেক কবির —

১. নানা প্রমাণ প্রয়োগে জীবৎকাল নির্ণয় করেছি;

২. ক্ষেত্র গবেষণায় জন্মস্থান নির্ণয় করেছি এবং পূর্বসূরিদের মতামত, আলোচনা, মতদ্বৈধতা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করেছি।

৩. পিতামাতার পরিচয় গ্রহণ করেছি কবিদের নিজের লেখা সূত্র থেকে। অবশ্য পূর্বসূরিদের মত সর্বত্রই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছি।

৪. এমনিভাবেই আমরা কবিদের গুরু প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি, সম্ভবক্ষেত্রে গুরুর নামের সঙ্গে তার বিস্তৃত পরিচয়ও দিয়েছি।

৫. জীবনী রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যার্জন, শাস্ত্রালোচনা ইত্যাদির দিকটিও আমরা নজরে এনেছি।

৬. প্রত্যেক কবির কাব্য থেকে তাঁদের কি ধরনের বৈষ্ণব মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাও বিশ্লেষণ করেছি।

তবে জয়ানন্দ, লোচনের জীবনী রচনায় আমরা তাঁদের গ্রন্থগুলি থেকে যেভাবে সাহায্য পেয়েছি, চূড়ামণিদাসের পুঁথিটি খণ্ডিত বলে আমরা সেভাবে সাহায্য পাইনি। কিন্তু চূড়ামণিদাসের গ্রন্থ থেকে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তারও মূল্য কম নয়।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য তিন কবির কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় গ্রহণ করেছি এবং এক্ষেত্রে আমরা একটি ক্রম মেনে নিয়েছি। কাব্যের রসবস্তু তো উদ্ধার করেইছি কিন্তু তার থেকেও এঁদের কাব্যে যে বিষয়গুলি আমাদের আবিষ্ট করে সেগুলি হল এর সামাজিক তথ্য ও ঐতিহাসিক উপাদান। আমরা মনে রেখেছি এগুলি জীবনী কাব্য, জীবন ইতিহাসের কাব্য, বিশুদ্ধ গীতিকবিতা নয়, তাই বৈষ্ণব পদাবলির মধ্যে যে রসবস্তু পাই বর্তমান জীবনী কাব্যগুলিতে তার অনুসন্ধান বৃথা। তাহলেও কাব্যের কোনো কোনো স্থানে, কোনো বিশেষ ভাবাবেগ বা ঘটনা বর্ণনায় কবিদের মন উচ্ছ্বসিত হয়েছে। তাঁরাও আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। বিশেষ করে জয়ানন্দ ও লোচনদাসের কাব্যের কোনো কোনো অংশে ও লোচনদাসের গীতগুলিতে তাঁদের আবেগ মুখর পদ্যবন্ধ বা রোমান্টিক আবেশ রচনায় আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি না। তবে

কাব্যালোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা কবিদের রচনাকাল নির্ণয় করেছি। রচনাকাল নির্ণয়ে আমরা পূর্বসূরিদের মতামত তো গ্রহণ করেইছি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছি। কারো কারো মতামতকে উপেক্ষা করতে পারিনি এবং কারো কারো মতামতকে নানা প্রমাণসহ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছি।

কবি জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটি ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়, লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থটি ১৫৬৫ খ্রিঃ থেকে ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এবং চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়েছে বলে আমরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি।

জীবৎকাল নির্ণয়ে কবিত্রয়ের স্বরচিত গ্রন্থমধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু পরিচয়াত্মক অংশ, প্রাচীন বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্য ও একালের পণ্ডিতদের কিছু কিছু অভিমত গ্রহণ করেছি। কবি জয়ানন্দের জীবৎকালকে নানা প্রমাণ ও যুক্তিসহ স্থির করেছি যে কবি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী যে কোনো এক সময়ের বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে জীবতি ছিলেন। কবি লোচনদাসের জীবৎকাল নির্ণয়ে আমরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি কবি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের একেবারে প্রথম দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু চূড়ামণিদাসের খণ্ডিত পুথি থেকে ও মুদ্রিত গ্রন্থের বিভিন্ন ইঙ্গিতবহ শ্লোকাদি থেকে তাঁর জীবৎকাল অনুমিত হয়েছে যে, কবি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

কবি জয়ানন্দের জন্মস্থান কবি প্রদত্ত আত্মবিবরণী থেকে পরিলক্ষিত হয়। কবি বলেছেন —

"বর্দ্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
মাঞিপুরা তার নাম।"

এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা গ্রামটির অনুসন্ধানে তৎপর হই। এই গ্রামটির সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার জন্যে আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের মতামতকে অনুসরণ করি। ড. সুকুমার সেন বলেছেন 'আমাইপুরা' (মাঞিপুরা) বর্দ্ধমান জেলার বড়োয়া গ্রামের নিকটে ছিল বা বর্তমানে থাকতেও পারে। এই মতকে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, ড. শুকদেব সিংহ সমর্থন করেছেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী, ড. প্রণয়চাঁদ মহ্‌তাব (বর্ধমান রাজবংশের উত্তরপুরুষ), বর্ধমান জেলার তিন ইতিহাস রচয়িতা নারায়ণ চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী এবং সুধীরকুমার দাঁ এছাড়া সুধীর কুমার মিত্র, ড. সুনন্দা দত্ত প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু তাঁরা কেউ-ই আমাইপুরা গ্রামটির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেননি, সকলেই ড. সুকুমার সেনের মতকেই সমর্থন করেছেন। তাই আমরা তাঁদের মতানুসারে বড়োয়া গ্রামটি পরিদর্শনে যাই। কিন্তু গ্রামটি পরিভ্রমণ করে এবং সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথাবার্তা বলেও কোনো সূত্র পাই না 'আমাইপুরা' গ্রামটির সম্বন্ধে। সমালোচকদের অনেকের মতে সুবুদ্ধি মিশ্রের শ্রীপাট ছিল বেলগাঁ বা গুপ্তিপাড়া। আমরা সেখানেও গ্রামটির পরিভ্রমণে উপস্থিত হয়েছিলাম অথচ 'আমাইপুরা' গ্রামটির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে কেউ কোনো তথ্য দিতে পারেননি। আমরা গ্রামটির অবস্থান যে বড়োয়ার নিকটবর্তী হতে পারে এটি মনে করতে পারি। এর জন্য উপযুক্ত যুক্তি নির্ভর তথ্যাবলি আমরা উল্লেখ করেছি এবং যথাস্থানে চিত্র প্রদান করেছি। কবি জয়ানন্দ

# ১ শ্রীচৈতন্য ও সমসাময়িক যুগ

ক. পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাংলায় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রেক্ষিত

খ. সপারিষদ শ্রীচৈতন্য

সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এদেশের একটি সমুল্লেখ্য ঘটনা। কারণ সমকালীন বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, ধর্মীয় ভাবনা, সমাজসংগঠন, মননচিন্তা ও সাহিত্য সৃষ্টি ঐ অকল্পনীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষকে ঘিরে অনেক বিচিত্র দিকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> "পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোনো ঘটনাই জাতীয় জীবনে এত সুদূরপ্রসারী ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ..... পৃথিবীর আর কোনো ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালোবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বের নিকট এত স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত নির্ঝর, অলঙ্কার দর্শন ও বিধিরচনার এমন আশ্চর্য মননশক্তি, ধর্মচেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।"[১]

বস্তুত শ্রীচৈতন্য তাঁর জীবৎকালেই ভগবানের অবতার বলেই পূজিত হয়েছেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ভাবনা ও কৃষ্ণপ্রেমাসক্তি তাঁকে সকলের সামনে দেবোপম মানুষ বলেই চিহ্নিত করে। তাঁর জীবনকাহিনী, নামসংকীর্তন সকলের কাছেই সাদরে গৃহীত হয় এবং তাঁর সঙ্গলাভ ঈশ্বরের সাহচর্য লাভ করবার মতো পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়। যার ফলে সেই সময়ে কবি সাহিত্যিকরাও তাঁর পূত জীবনকথা নিয়ে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। প্রচলিত রীতিতে সংস্কৃত ভাষাতে যেমন গ্রন্থ রচিত হয় তেমনি বাংলা ভাষাতেও কাব্য লেখা হয়।

**ক) সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যবিষয়ক গ্রন্থ : —**

১. মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' বা 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম্'।
২. কবি কর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য', 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক, 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' প্রভৃতি।
৩. স্বরূপ দামোদরের কড়চা।

এছাড়াও সংস্কৃত ভাষাতে আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হয়।

**খ) বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যবিষয়ক গ্রন্থ : —**

১. বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'
২. জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'
৩. লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'
৪. চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'

৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'
৬. 'গোবিন্দদাসের কড়চা' (এই বইটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে)।

এই সমস্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু গ্রন্থ সযত্নে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। কিছু গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গেছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ দুটি। কিন্তু জয়ানন্দ, লোচন ও চূড়ামণিদাসের গ্রন্থ তিনটি বৈষ্ণব সমাজের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় বৈষ্ণব সমাজে উপেক্ষিত এই তিন কবির তিনটি গ্রন্থ; এই তিনটি গ্রন্থ থেকেই শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্মভাবনা ব্যাখ্যানে কবিত্রয়ের সামর্থ্য ও অভিনবত্ব উপস্থাপন করা।

কিন্তু কোনো মহান ব্যক্তিত্বকে, বিশেষ করে তার জীবনধর্মকে উপলব্ধি করতে হলে, প্রথমেই তাঁর সামাজিক প্রেক্ষিতটি অনুধাবন করতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম পঞ্চদশ শতকে তাই তাঁর জীবন ও আচরিত ধর্মকে উপলব্ধি করবার পূর্বে তাঁর সমকালীন যুগ পরিবেশটি উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতটি আলোচ্য অধ্যায়ে বিবৃত করা হয়েছে দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে :

১. এই দুই শতকের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয়।
২. যে বিশিষ্ট মানব-পরিমণ্ডলে শ্রীচৈতন্য নিজেকে সর্বদিক দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, সেই পরিকরবর্গের পরিচয় দান।

## ক. পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাংলার প্রেক্ষিত

### (১) রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটনা মধ্যযুগের ইতিহাসকে আলোড়িত করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ও মৃত্যু ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়কালকে অনেক সমালোচক 'চৈতন্যযুগ' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু 'চৈতন্যপ্রভাব' চৈতন্য তিরোধানের পরবর্তী সময়কালে বিস্তার লাভ করে। তাই 'চৈতন্য তিরোধানের পরবর্তী সময়কালকে 'চৈতন্যযুগ' বলাই যুক্তিসঙ্গত'। আমাদের আলোচ্য বিষয় চৈতন্য পূর্ববর্তী ও চৈতন্য অব্যবহিত পরবর্তী সময়কাল। এই সময়কালের অশান্তকর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটি ইতিহাসের কালানুক্রমিক ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। ইলিয়াস শাহি বংশের দ্বিতীয় ধারার অবসানপর্বে হাবশি খোজাদের শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩) বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই চিত্র বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থের পাশাপাশি বিভিন্ন চৈতন্যচরিতগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে যবনদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে যবনরাজকে বলেছেন 'মহাতীব্র নরপতি'। অন্যান্য চরিতকাররাও যবনরাজের অত্যাচার লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু জয়ানন্দের মতো এত স্পষ্ট করে কেউই যবনরাজ কাহিনীর তথ্য দেননি। যা ঐতিহাসিকেরা সমর্থন করেছেন। কবি জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের প্রাণ বধ, তাদের সম্পত্তি লুট, জাতি ও ধর্ম নাশ করছে। কারণ, নবদ্বীপের নিকটবর্তী গ্রামের এক শ্রেণীর মুসলমানদের উস্কানিতে তিনি বিচলিত হয়ে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতে থাকেন। কেউ কেউ বলেন এই গৌড়েশ্বর হচ্ছেন জলালুদ্দিন ফতেহ শাহ্। আবার কেহ কেহ বলেন হুসেন শাহ। ফতেহ শাহ্‌র রাজত্বের (১৪৮১-৮২ খ্রি.-১৪৮৭-৮৮ খ্রি.) একেবারে শেষ দিকে শ্রীচৈতন্যের

আবির্ভাব ঘটে। ফতেহ শাহ্ হিন্দুদের প্রতি উদার ছিলেন না। কবি জয়ানন্দের কাব্যে গৌড়েশ্বরের অত্যাচার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে :

'আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লএ তার জাতি নাশ করে।।[২]

তাঁর সময় থেকেই হাবশি সেনাদের বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা যায়। হাবশিদের মধ্যে ফিরোজ শাহ, মুজাফ্ফর শাহ, হাব্শ্ খান, কাফুর প্রভৃতির নাম বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ও শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়। এঁরা বাংলায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। তাঁরা অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন; শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ রাজা হয়ে বহু দরবেশ, আলিম ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করেছিলেন এ তথ্যও পাওয়া যায়। ফলে তখন বাংলায় দেখা দেয় বিশৃঙ্খল অবস্থা। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থে আমরা হাবশিদের বিবরণ দেখতে পাই।

তাই বলা যায় শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বার্ধে ও জন্মের পরবর্তী কিছু সময় দেশের রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। এবং সেই সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ অহরহই লেগে ছিল, প্রতিনিয়তই তাই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

এমতাবস্থায় বাংলার শাসনকর্তা হল হুসেনশাহি বংশের লোকেরা। শামসুদ্দিন মুজাফ্ফরের উজির বা অমাত্য ছিলেন সৈয়দ হোসেন। হাবশি সুলতান ছিলেন শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর। এই মুজাফ্ফর শাহ তাঁর প্রভুকে হত্যা করে রাজসিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁরই উজির আবার নিজের অভিজ্ঞতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির বলে তাঁকে হত্যা করেন। এবং এই সৈয়দ হোসেন নিষ্ঠুর প্রজাপীড়নকারী দাম্ভিক শাসকের হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কুশাসন ও নৈরাজ্য যেন বাংলাকে গ্রাস না করে, তাই তিনি তাঁর প্রভুকে হত্যা করে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন। সিংহাসনে বসেই তিনি প্রথমে হাবশি সেনা ও দেহরক্ষীদের বিদায় দিয়ে দেশ শাসনের উপযোগী সেনা ও অভিজ্ঞ দেহরক্ষীকে নিয়োগ করেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। হাবশি শাসনে অভিজাত শ্রেণির অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তাকে পুনরায় স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন তিনি। এবং হিন্দু ও মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন।

তিনি "কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যাবিজয়ী" বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তবে কামতাপুর ও কামরূপ তিনি সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। এই বিবরণ ঐতিহাসিক মতে সত্য। কারণ, বুকাননের বিবরণী, "রিয়াজ" এবং ঐ সব অঞ্চলের কিংবদন্তিই এর প্রমাণ দেয়। উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার যুদ্ধ বেশ বহুদিন ধরেই চলেছিল। উড়িষ্যায় যুদ্ধকালীন অবস্থায় তিনি ও তাঁর সেনাপতি ইসমাইল গাজি নিষ্ঠুরভাবে সেখানকার বহু দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেছিলেন এবং বহু হিন্দুকে অকারণেই হত্যা করেন। তখন প্রাণভয়ে অনেকে নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। জগন্নাথ মন্দিরের মাদলাপাঞ্জি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'কটকরাজবংশাবলী' গ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যায়। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হুসেন শাহের সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করেছেন :

"চৈতন্য চরিতামৃতে'র মতে হুসেন শাহ নাকি তাঁহার বেগমের অনুরোধে পূর্বতন প্রভু ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি রায়কে 'কারোয়ার পানি' পান করাইয়া জাতি নাশ করিয়াছিলেন। হয়তো এই সমস্ত গালগল্পের পশ্চাতে কিছু সত্য থাকিতে পারে। স্বার্থবুদ্ধি অথবা অত্যাচারের ভয়ে এই সময়ে যে

কিছু কিছু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বারবোসা নামক এক পর্তুগিজ পর্যটক ১৫১৪ খ্রি. অব্দে বাঙলা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার ভ্রমণলিপিতে আছে যে, গৌড়ের মুসলমান সুলতানের দয়া ও সুযোগ-সুবিধা পাইবার জন্য বহু হিন্দু ('Gentiles') মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রূপসনাতনও সুলতান সাহচর্যে ও দরবারি আদর্শে খানিকটা মুসলমানি আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে চৈতন্যসংস্পর্শে বৈষ্ণব হইয়াও তাঁহারা স্বসম্প্রদায়ে একটু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন।"[৩]

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের বিজয়খণ্ডে দেখা যায় রাজা প্রতাপরুদ্র বাংলাদেশ আক্রমণ করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব রাজাকে বলেন 'কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর' মহাশক্তিধর; তিনি যদি বাংলাকে আক্রমণ করতে যান তাহলে তিনি উড়িষ্যা উচ্ছন্ন করে দেবেন এবং জগন্নাথকে নীলাচল থেকে ত্যাগ করাবেন।

যুদ্ধকালীন অত্যাচার ছাড়া হুসেনকে উগ্র সাম্প্রদায়িক শাসক বলা যায় না। হুসেন শাহকে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশাসক বলা হত। কবি, জ্ঞানী, গুণী মানুষের তিনি সমাদর করতেন। তার জন্য তাঁর মনে কোনো জাতিবিচার ছিল না। হুসেন শাহ ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় রাজ্যশাসন করেছিলেন। হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু নুসরৎ শাহের পর হুসেন শাহি বংশ লুপ্ত হয়েছিল।

তবে নুসরৎ শাহ রাজ্যশাসনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেছিলেন। তিনি শ্রীকর নন্দীকে 'মহাভারত' লিখতে আদেশ দেন। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত 'ছুটি খানের মহাভারত' নামে পরিচিত।

তাঁর সময়ে মোঘল-পাঠানের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তবে তিনি বাংলাকে এর থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই তিনি বাবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আফগান দলপতিদের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করেন এবং মোঘলদের সঙ্গে কৌশলে বিরোধিতা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত কলাকৌশল ব্যর্থ করে দেন আফগানদের দলপতি শেরশাহ। বিপদসঙ্কুল অবস্থায় নুসরৎ শাহ রাজ্যশাসন করেছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ছিল অসীম। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে এক আততায়ী দ্বারা খুন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ। তাঁরই প্রেরণায় 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটি শ্রীধর কবিরাজ প্রথম রচনা করেন। আলাউদ্দিন ফিরুজের পিতৃব্য আবদুল বদর তাঁকে হত্যা করে গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ নাম নিয়ে সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি ১৫৩৩-৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেছিলেন তবে তাঁর রাজ্যশাসনের কোনো যোগ্যতাই ছিল না। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর কাল গৌড়দেশ শাসন করেন। এবং ঐ সময়েই (১৫৩৩ খ্রি.) মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান হয়। হুসেন শাহি বংশের রাজত্বকালের সূচনায় শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যকাল, এবং এই বংশ লুপ্ত হওয়ার সময়েই তাঁর তিরোধান ঘটে।

হুসেন শাহি বংশের অবনতির পরই সুর বংশের দলপতি শের খাঁর কর্তৃত্ব আসে গৌড়দেশে। গৌড় অধিকার করার পর শের খাঁ শোনেন যে, হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের জন্য আসছেন, 'তখন তিনি আধুনিক রাজনীতির 'পোড়ামাটি'র নীতি অনুসরণে গৌড় নগর ধ্বংস করে ছ কোটি স্বর্ণমুদ্রা, সেনাবাহিনী ও অনুচরসহ রোটাসগড়ের দিকে যাত্রা করেন' এবং চাতুর্যপূর্ণ, কুটনীতি বিশেষজ্ঞ শেরশাহ বুদ্ধির বলে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন কর্মনাশার পূর্ব-তীরে বক্সারের দুই ক্রোশ পশ্চিমে চৌসার যুদ্ধে এবং কনৌজের কাছে বিল্ব গ্রামের যুদ্ধে। তারপর তিনি দিল্লির বাদশা হন এবং অনুধাবন করেন দিল্লি থেকে বাংলাকে শাসন করা সহজ নয়। তাই তিনি

দেশকে কতকগুলি জায়গীরে ভাগ করেন। আফগান দলপতিদের উপর বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্বভার দেন। এইভাবেই জায়গীর প্রথার উৎপত্তি হয়। শেরশাহ পাঁচ বৎসর কাল দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সারা দেশ তথা বাংলায়ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং সমগ্র দেশে সুশাসক রূপে চিহ্নিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহসুর আট বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে সুশাসক রূপেই রাজ্য শাসন করেন। এরপর সুর বংশের অবনতি ঘটতে থাকে তখন তাজ খাঁ কররানি বাংলার মসনদ অধিকার করেন এবং কররানি বংশের সূত্রপাত হয়। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কররানি বংশের শাসনধারা চলতে থাকে। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর মুনিম খাঁ সম্রাট আকবরের সাহায্যে দাউদ খাঁ কররানিকে সিংহাসনচ্যুত করে বাংলার রাজধানী টাঁড়ায় প্রবেশ করলেন এবং বাংলার বুকে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করলেন।

## (২) সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত

বাংলায় বিভিন্ন রাজবংশীয় শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতনের ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাস, জনজীবনধারা ও সাংস্কৃতিক বিষয়টি অতি জটিল ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশের মধ্যে নবদ্বীপে যেমন একদিকে পণ্ডিতদের প্রভাব তেমনি অন্যদিকে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ছিল প্রভূত। নবদ্বীপ বাংলাদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ও প্রধান সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক শহর রূপে পরিগণিত হয়। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' নবদ্বীপের বর্ণনা দেখা যায় এইভাবে :

'নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।'[৪]

কিন্তু অহরহ রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের ফলে দেশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাতে তৎকালীন সমাজ জীবনে তার প্রতিফলন দেখা দেয় এবং সমাজে সুবিধাবাদীদের কদর বেড়ে যায়। অপদার্থ, কপট, ক্ষমতালোভীরা সমাজের উচ্চাসনে নিজেদের অধিষ্ঠিত করেন দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের হটিয়ে। এবং মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট হয়ে একশ্রেণির মানুষ এবং কাজী, মোল্লারা হিন্দুদের উপর সর্পের ন্যায় বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলতে থাকে। এতে অনেক পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিরা নবদ্বীপ ছেড়ে দেশান্তরিত হন। সমাজে ভাঙ্গন ধরে। অনেক হিন্দু বাধ্য হয়ে, ভয়ে বা একটু সুবিধা আদায় করার জন্য ধর্মান্তরিত হতে থাকেন।

তাছাড়া সেই সময়ে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেই জাতিবিচার বা বর্ণভেদ প্রথার অধিক প্রচলন ছিল। উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের মানুষদের পীড়ন করত, তাদেরকে অস্পৃশ্য জাতি বলে দূরে সরিয়ে রাখত। ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্থান সর্বাগ্রে করে নিয়েছিল। তখন মানুষের পাণ্ডিত্য ছিল, বিনয় ছিল না; জ্ঞান ছিল কিন্তু ভক্তি ছিল না। বাহ্য আচরণ ক্রিয়াকর্মের আধিক্য ছিল বেশি। ব্রাহ্মণরা আচার অনুষ্ঠানে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেন।

তখন মঙ্গলচণ্ডীর পূজা, বিষহরির পূজার প্রচলন ছিল। মদ্য-মাংসে লিপ্ত হয়ে বামাচারী তান্ত্রিকরা সমাজের মধ্যে কলুষতা আনয়ন করছিলেন। তাঁরা নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে যাগযজ্ঞাদি পূজার প্রচলন করলেন। বিভিন্ন চৈতন্য জীবনী-গ্রন্থে হিন্দুদের এই ভক্তিহীন পূজা আচারের বর্ণনার প্রকাশ ঘটেছে।